SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

পালঙ্ক: অবক্ষয়ের অন্ধকারে চিরন্তন মানবতার বিজয়গাথা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের আখ্যানে

ড. মোস্তাক আলি
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালীগঞ্জ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ORCID
https://orcid.org/0009-0000-2428-5459
e-mail- **mostakmritti@gmail.com**

Received Date- 10.12.2025
Selection Date -15.01.2026
Page- 94 -106

Keywords
Narrative, Audience, Liberal, Narrator, Experiment, Modify, Change, Addition

Abstract-

Narendranath Mitra's story 'Palanka' included in the collection 'Galpamala' was published in the Puja issue of Anandabazar Patrika in 1952. Based on this story written by Narendranath Mitra, director Rajen Tarafdar made the film 'Palanka' in 1975. In this story, written in the context of the fifties, the writer has passed on the eternal human quality; In this film made by a joint effort of India and Bangladesh, the director portrayed him in a new guise on celluloid in the context of the post-liberation war of Bangladesh in 1971. In the film, the director has followed the story exactly as described in the written narrative. He did not like experiments in narrative narration. He believed that films should be made with a liberal attitude in simple language, keeping the audience in mind. The director has presented the tragic picture of the history we have left behind to the audience with great skill. In the very first scene, the narrator enters the heart of the story by highlighting a particular moment. The story of Suren and Sabdul's ancestors Rajmohan and Maqbool was shown very skilfully in the flashback following the written narrative highlighting the events of the liberation war and the glorious narrative of Bengali on the screen. He has modified and changed many parts of the main narrative in the film; he has also given a special message to the audience by adding many parts outside the narrative.

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

Main Discussion

'গল্পমালা' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' গল্প ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিগত শতাব্দীর পাঁচের দশকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে লিখিত এই গল্পে লেখক চিরন্তন মানবতাবাদের চিত্র তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক কারবারিদের সিংহাসন লাভের উন্মাদনা ও ক্ষমতার বহর দেখানোর প্রতিযোগিতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মহানগরীর রাজপথে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার যে সূচনা হয়েছিল পরবর্তী প্রায় তিন দশকব্যাপী এই অমানুষিক নৃশংসতার ধারাবাহিক অভিযান, নারীহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ ও জোরপূর্বক বিয়ে ইত্যাদির ফলে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ প্রাণের ভয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখার অভিপ্রায় ও জিজীবিষায় নিজ বাসভূমি ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশভাগের কারণে অনেকেই ভিটেমাটি ছেড়ে ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তু হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে গেলেও অনেকেই দেশভাগের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে নানা অত্যাচার সহ্য করে দেশের মাটিকে আঁকড়ে ধরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত টিকে ছিলেন। কোনোভাবেই নিজেদের মমত্ব, সৌভাতৃত্ব ও মানবিকতাকে বিসর্জন দেননি। সময়-সমাজের অনিবার্য দুর্লঙ্ঘনীয় কঠোর তিক্ত বাস্তবতার নিষ্পেষণে তাদের জীবন বিষময় হয়ে উঠলেও মানবতাবাদী লেখক এই গল্পে নিষ্পেষণ পীড়িত জীবনের ছবি চিত্রায়ণের সমাপ্তিতে বেঁচে থাকার স্বপ্নকে তুলে ধরেছেন, যেখানে জীবনের সীমাহীন কদর্থক অনুষঙ্গের আড়ালে ফুটে উঠেছে আশাবাদী জীবনের আলাপন। ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষের বিপরীতে আজীবন লালিত এই প্রেম-ভালোবাসার চিত্রই তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। ১৩৮২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'গল্প লেখার গল্প' শীর্ষক বেতার-কথিকায় লেখক বলেছিলেন—

> "...পিছন ফিরে তাকিয়ে বই না পড়ে নিজের গল্পগুলির কথা যতদূর মনে পড়ে আমি দেখতে পাই ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি। বরং বিপরীত দিকে প্রীতি প্রেম সৌহৃদ্য, স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা, পারিবারিক গণ্ডির ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি।
>
> অথচ জানি সংসারে আচার অবিচার অত্যাচারের অভাব নেই। প্রেমের শক্তি যেমন শক্তি, প্রয়োজনবোধে ঘৃণা বিদ্বেষের শক্তিও তেমনি। বৃহত্তর প্রেম গভীরতর কল্যাণকে অবারিত করার জন্য সেই শক্তির প্রয়োজন আছে। শুধু আলিঙ্গন নয়, দরকার হলে আঘাত করতেও

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

জানা চাই, আঘাত করতেও পারা চাই। সেই পৌরুষ, সেই বীর্যবত্তা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে, লেখকের রচনার মধ্যে দীপ্তি এনে দেয়।

কিন্তু এই তত্ত্ব আমি জ্ঞান দিয়ে জানি, বুদ্ধি দিয়ে জানি। একে হৃদয়রসে জারিত করে রসরূপ দিতে জানিনে। নিজের স্বভাবকে দেখে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারাজীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সংকীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা। তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১]

চারপেয়ে একটি জড়বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এই গল্পের প্রধান চরিত্র রাজমোহন রায় ওরফে ধলাকর্তা। প্রাণের ভয়ে জীবনের বাজি রেখে একে একে তাঁর সকল পরিচিত এমনকি একমাত্র পুত্র সপরিবারে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ ছেড়ে চলে গেলেও 'ছিন্নমূল জীবনের উপান্তে বসে থাকা' এই মানুষটি কোনোভাবেই নিজের ভালোবাসাকে ত্যাগ করেননি বরং নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে আপন দেশ, দেশের সংস্কৃতি, নদী-নালা-জল-মাটি-বাতাসের আঘ্রাণ গায়ে মেখে অচল অটল মহীরুহের মতো দেশের মাটিকেই আঁকড়ে থেকেছেন। কিন্তু হঠাৎই একদিন পুত্রবধূ অসীমা চিঠিতে নিজেদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে বিয়েতে যৌতুক হিসেবে পাওয়া পালঙ্ক বিক্রি করে কলকাতায় টাকা পাঠানোর কথা বললে তা ধলাকর্তার অহংবোধকে পীড়া দেয় এবং মর্মাহত ও অভিমানাহত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ পালঙ্ক বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন। দিনমজুর মকবুল সেই পালঙ্ক ঘিরে স্বপ্ন দেখে নব দাম্পত্যের। স্ত্রী ফতেমা ইতস্তত করতে থাকে আগামী দিনের সচ্ছলতার আশায় সঞ্চিত ধন মকবুলের হাতে তুলে দিতে, কিন্তু মকবুল তাকে স্বপ্নসন্ধানী নৌকায় ভাসিয়ে বৈতরণী পার হয় ও নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে পালঙ্ক কিনে নেয় ধলাকর্তার কাছ থেকে। অন্যদিকে ক্রোধের বশে পালঙ্ক বিক্রি করলেও রাজমোহন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে সেই পালঙ্ক ফিরিয়ে নিতে চাইলে মকবুল দিতে অস্বীকার করে। রাজমোহন রায় নানা অছিলায় মকবুলের বাড়ি গিয়ে সন্তানতুল্য পালঙ্কটিকে বার বার দেখে আসেন এবং কখনও অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে মকবুলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চান। মকবুল রাজমোহন রায়ের প্রলোভনে পা দেয় না, কারণ এই রাজপালঙ্ক তার কাছে প্রাণহীন জড়বস্তু নয়, তা পুরুষের তেজ, অহংকার। মকবুলের পৌরুষত্বকে দমন করতে না পেরে রাজমোহন রায় শেষপর্যন্ত চিরাচরিত ও সামাজিক প্রবাদ অনুযায়ী হাতে না মেরে ভাতে মারার পরিকল্পনা করেন। শুরু হয় নানা অসহযোগ, ক্ষুধার রাজ্যে তাকে আটকে রেখে পালঙ্ক ফেরানোর নানা ফন্দি-ফিকির। অন্যদিকে, নুন আনতে পান্তা ফুরানোর সংসারে ফতেমা স্বামীকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দেবার কথা বললে মকবুল বিরক্ত হয়---- কোনো কিছুর বিনিময়ে তার পৌরুষত্বকে বিক্রি করবে না। মকবুলের পালঙ্ক ফেরত না দেওয়াতে ধলাকর্তারও পৌরুষত্বে আঘাত লাগে। মকবুলকে পালঙ্ক বিক্রি করে গ্রামের লোকের প্ররোচনায় সেই পালঙ্ক ফিরে পাওয়ার জন্য নানা অসৎ উপায় অবলম্বন করলেও শেষপর্যন্ত পালঙ্কের উপরে শায়িত মকবুলের দুই সন্তানের মধ্যে আরাধ্য দেবতার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পান ও জিতে যায় দুই ভিন্ন জাতের নবীন ও প্রবীণ পালঙ্ক প্রেমিক — "ধোঁয়া-ওঠা ক্ষীণ দীপের আলোয় মুহূর্তকাল দুই যুগের

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

দুই পালঙ্ক-প্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্ক-প্রেমিক, ধলা আর কালো— দুই রঙের দুই পালঙ্ক-প্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।"[২]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত 'পালঙ্ক' গল্পের কাহিনি অবলম্বন করে পরিচালক রাজেন তরফদার ১৯৭৫ সালে 'পালঙ্ক' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। পঞ্চাশের দশকের প্রেক্ষাপটে 'ভাঙন ধরা সমাজ-দেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে' লেখক যে 'চিরন্তন মানবীয় গুণের উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন', ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রয়াসে নির্মিত এই চলচ্চিত্রেও পরিচালক '৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে তাকে নতুন আঙ্গিকে নতুনভাবে চিত্রিত করলেন। এই সূত্রেই উঠে এসেছে দেশভাগ ও তার অনিবার্য ফলস্বরূপ ছিন্নমূল জীবনের সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভারত-পাকিস্তান অধিবাসী বিনিময়ে জওহরলাল-লিয়াকত চুক্তি (১৯৫০), শ্রেণিবৈষম্য, উর্দুভাষী শাসকদের একনায়কতন্ত্র ও বিজাতীয় শাসকদের হাত থেকে নিজেদের ভাষিক জাতি স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

ছবির শুরুতেই আবহমান নদীমাতৃক বাংলার চিত্র তুলে ধরেছেন পরিচালক। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানের সুরে ভাষ্যকারের কণ্ঠে শোনা যায়, মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে গৃহত্যাগীরা স্বদেশে ফিরছেন। মকবুলের ছেলে সবদুলের নৌকায় রাজমোহনের পুত্র সুরেন রায়কে দেখা যায়। দেশ স্বাধীন হলেও পথঘাট সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত নয়। এরপর কাহিনি অতীতের দিকে মুখ ফেরায়। দিনমজুর মকবুল একটা চিঠি রাজমোহনকে দেয়। পুত্রবধূ অসীমার পালঙ্ক বিক্রির অনুরোধজ্ঞাপক চিঠির মুসাবিদা দেখে হাতের লেখার প্রশংসায় রাজমোহন রায়ের মনে আভিজাত্যের জৌলুষ, বংশমর্যাদা ও বর্ণবৈষম্যের ছাপ ফুটে ওঠে। কিন্তু চিঠিতে যৌতুক হিসেবে পাওয়া পালঙ্ক বিক্রি করে টাকা পাঠানোর প্রস্তাবে রাজমোহন রায় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পালঙ্ক বিক্রি করে তৎক্ষণাৎ কলকাতায় মানি অর্ডার করার সিদ্ধান্ত নেন। পালঙ্ক ঘিরে দিনমজুর মকবুলের মনের মধ্যে প্রেমের নতুন সুর ভেসে ওঠে এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রক্ত জল করা শ্রমের বিনিময়ে মকবুল রাজমোহনের কাছে থেকে পালঙ্ক কিনে নেয়। হঠকারিতার বশে নিজের সন্তানতুল্য পালঙ্ককে মকবুলের হাতে তুলে দিলেও রাগ পড়ে গেলে তিনি মকবুলের কাছে প্রদেয় অর্থের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে পালঙ্ক ফেরত চাইলে মকবুল দিতে অস্বীকার করে। সেই রাজপালঙ্কতে মকবুল নব দাম্পত্যে মেতে ওঠে। সন্তানসম সেই পালঙ্ক দেখার জন্য রাজমোহন কাশির অছিলায় মকবুলের বাড়ি গিয়ে লুকিয়ে দেখে আসেন ও বৃষ্টির জলে পালঙ্ক নষ্ট হবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হন। ফতেমা বার বার স্বামীকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দেবার কথা বললে মকবুল ক্রোধান্বিত হয়। অন্যদিকে, গ্রামের অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও সেই পালঙ্ক হাতানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে। তারা কখনও মকবুলকে অর্থের প্রলোভন দেয়, আবার কখনও রাজমোহনকে মকবুলের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকে। পালঙ্ক-র জন্য গ্রামের প্রভাবশালী সকলেই একই সুরে কথা বলে। সামান্য দিনমজুরের ভাঙাঘরে এমন সোনার জিনিস তারা কল্পনাও করতে পারে না। রাজমোহনের বাড়িতে সালিশি সভা বসে। সালিশি সভায় আগত মুসলিম প্রতিনিধিরা মাইনরিটির স্বার্থের অজুহাত দেখিয়ে মকবুলকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে বললে মকবুল তার

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। যা সমাজপতিদের কাছে আস্পর্ধার শামিল। যেনতেন প্রকারে পালঙ্ককে হস্তগত করতে তার বিরুদ্ধে শুরু হয় গভীর ষড়যন্ত্র ও অসহযোগিতা। তাকে সামাজিকভাবে বহিষ্কার করা হয়। তার কাজ বন্ধ হয়, কেউ-ই তার দুধ কিনতে চায় না কখনও রাজমোহনের পরামর্শে আবার কখনও গ্রামের মোড়লদের চক্রান্তে একঘরে হবার আশঙ্কায়। কিন্তু শত অত্যাচার, দারিদ্র্য-রোগ-শোকে জর্জরিত হয়েও মকবুল পালঙ্ককে জীবনের শেষ বিন্দু দিয়ে রক্ষা করে। কারণ এই পালঙ্ক তার কাছে শুধু গৃহ সৌন্দর্য বর্ধনকারী কোনো সামগ্রী নয়, এটা তার তেজ, অহংকার। অন্যদিকে পালঙ্ক বেহাত হবার সংবাদ পেয়ে রাজমোহন দুর্যোগপূর্ণ ঝড়-বৃষ্টির রাতে অসুস্থ শরীরে মকবুলের বাড়িতে উপস্থিত হলে মকবুল ধলাকর্তাকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু রাজমোহন নেন না। পালঙ্কে শায়িত মকবুল-ফতেমার সন্তানদের মধ্যে রাজমোহন আরাধ্য দেবতা তথা দেশমাতৃকাকে প্রত্যক্ষ করেন। দুজনেই পরম মমতায় একে অপরকে কাছে টেনে নেন। ধলাকর্তা বলেন মকবুল, মকবুল বলে ধলাকর্তা— দুটি সুর এক হয়ে ভোরের আজানে মেশে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন, "এর যে রঙিন মুহূর্তটি তা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর শেষ মুহূর্তের মতো ইচ্ছাপূরণের সত্য, জীবনের উৎসব। বাকিটা ধূসর অতীত। আমার বিবেচনায় এতবড় সাফল্য রাজেন তরফদার তাঁর কোন ছবিতেই পাননি। 'তিতাস একটি নদীর নাম' এর মতোই 'পালঙ্ক' মাতৃমুখ দর্শন।"[৩]

আলোচ্য চলচ্চিত্রে পরিচালক লিখিত আখ্যানে বর্ণিত কাহিনিকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। আখ্যান বর্ণনায় তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পছন্দ করতেন না— "পরীক্ষার নামে মাধ্যমের অকারণ জটিলীকরণ দর্শক সুনজরে দেখে না।"[৪] তিনি মনে করতেন, দর্শকের কথা মাথায় রেখে সহজ-ভাষায় উদার মনোভাবের সঙ্গে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা উচিত। তিনি বলেছেন, "চলচ্চিত্র স্রষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত তাঁর দৃষ্টিকোণকে এমনভাবে উপস্থিত করা যাতে অধিকাংশ দর্শক তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। চলচ্চিত্রের পরীক্ষা তাই নতুন সৌন্দর্য ছাড়াও পথ খুঁজবে দর্শকের সঙ্গে একাত্মতা-সাধনের। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে শিল্পী পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন শুধু তাঁর ব্যক্তিসত্তার ওপরে ভরসা করে, চলচ্চিত্রে যারা মুখ্য বিচারক সেই দর্শকের কথা মনে না রেখেই। তাঁদের সৃষ্টির মধ্যেও তাই কেমন একটা উন্নাসিকতার গন্ধ থাকে যা দর্শককে বিরক্তি দেয়, আনন্দ দিতে পারে না। পরীক্ষার উদ্দেশ্য যে শুধু পরীক্ষাই নয়, পরীক্ষার উদ্দেশ্য সুন্দরের সন্ধান— এ কথাটা হয় তাঁরা বোঝেন না, না হয় বুঝতে চান না। তার ফলে শিল্পের যারা সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক সেই দর্শক সমাজ অবহেলিত ও বিক্ষুব্ধ হন।"[৫] মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের চিত্র দিয়ে চলচ্চিত্র শুরু। দেশ স্বাধীন হলে মকবুলের ছেলে সবদুল শেখের নৌকায় সপরিবারে সুরেন রায় ঘরে ফিরছে। বাতাসে ভেসে আসছে চিরন্তন মিলনের সুর। সবদুল গাইছে— "আমার সোনার বাংলা,/আমি তোমায় ভালবাসি।" ধারাভাষ্যকারের আশ্রয়ে পরিচালক একে একে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা তথা বাঙালির গৌরবদীপ্ত আখ্যানকে তুলে ধরেন দর্শকের সামনে। এরপরই তিনি ফিরে যান অতীতের এক কালো অধ্যায়ে। লিখিত আখ্যানের অনুসরণে ফ্ল্যাশব্যাকে সুরেন ও সবদুলের পূর্বপুরুষ রাজমোহন ও মকবুলের কাহিনিকে তুলে ধরলেন অত্যন্ত সুকৌশলে। কাহিনির অন্তিমে দেখা যায় অসুস্থ রাজমোহনকে মকবুল এগিয়ে দিতে যায়। সাঁকোর উপরে

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

তাদের হাত ধরার ছবিটি ফ্রিজ করে দেন পরিচালক। নেপথ্যে কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়। আবার ধারাভাষ্যকার বলে যান, "অতীত কথা কয়! সম্ভাবিত হয় আর এক কাহিনী।" অতীতের এই চিরন্তন মানবতার চিত্রের রেশ ধরেই পরের দৃশ্যেই কাট করে দেখান, ডাঙ্গায় পিচ্ছিল পথে উঠতে গিয়ে সুরেন পা হড়কে পড়লে সবদুল তার হাত চেপে ধরে। এই দৃশ্যটিও ফ্রিজ হয়ে যায়। পর্দায় ভেসে ওঠে "এ কাহিনীর শেষ নেই!" অর্থাৎ পরিচালক এখানে অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধনে চিরন্তন মানবতাবাদের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

গল্প-আখ্যানের চলচ্চিত্রায়ণে পরিচালক যে আখ্যানাংশগুলি **পরিবর্জন ও পরিবর্তন** করেছেন সেগুলি হল :

১) বাড়ির দক্ষিণ সীমান্তে ছেলে সুরেনের বয়সী দেবদারু গাছে রাজমোহন নিঃসঙ্গতার মুক্তি পান। তিনি নিজের হাতে এই গাছ লাগিয়েছিলেন। অস্তিত্বের সংকটে পড়ে কাছের মানুষগুলো তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেলেও তারই মতো এই গাছটিও কোনো অবস্থাতেই নিজের স্থান পরিত্যাগ করেনি। চলচ্চিত্রে, রাজমোহনের নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র অবলম্বন কামরাঙা গাছ।

২) পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে চৌকিদার ইয়াকুবের সঙ্গে পালঙ্ক নিয়ে ফেরার পথে মকবুলের মধ্যে আত্মদম্ভ ফুটে ওঠে। মকবুলের পূর্বপুরুষেরা রাজমোহনের বাড়িতে কাজ করে অন্নসংস্থান করলেও তাদের প্রতি মুহূর্তে তাচ্ছিল্য, অপমান ও অবমাননা সহ্য করতে হত। দেশভাগ হওয়ার ফলে মুসলমান অধ্যুষিত নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে মকবুলদের মতো সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগে ওঠে। তারা মনে করে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত জিনিসের ওপর তাদেরই অধিকার। চলচ্চিত্রে মকবুলের এই মানসিকতা বর্জন করেছেন পরিচালক।

৩) সালিশি সভায় আগত ছদন মৃধা, বদন সিকদার, গেদু মুন্সী প্রমুখ মুসলমান প্রতিনিধিরা রাজমোহনকে মাইনরিটির স্বার্থ দেখা হবে বলে আশ্বাস দেয়। তারা মকবুলকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে বললে মকবুল তাদের কথায় রাজি হয় না। সভা শেষে সকলে চলে গেলে শরৎ শীল রাজমোহনকে বলে মুসলমানরা তলায় তলায় এক হয়েছে। এর ফলে ভীষণ অসহায়ত্ব ও একাকিত্ব গ্রাস করে ধলাকর্তাকে। এই মুহূর্তে পুত্রকে পাশে পেলে অনেকটা ভরসা পেতেন।

এই অংশে পরিচালক ভাষা আন্দোলন ও পশ্চিমী উর্দুভাষী শাসকদের একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচারী মনোভাবকে তুলে ধরেছেন। সালিশি সভায় সমবেত মুসলমান প্রতিনিধিরা সগর্বে জানায়, ভাষা নিয়ে বিতর্কের কোনো প্রয়োজন নেই, বাংলার বদলে উর্দুই মাতৃভাষা হওয়া উচিত। ছদন মৃধা, গেদু মুন্সী, বদন শিকদার, বিলাত আলি ও কাজী সাহেব সকলে মকবুলকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দেবার কথা বললে মকবুল তার প্রতিবাদ করে। উল্লেখিত অংশের পরিবর্তন ছাড়াও লেখক যেভাবে রাজমোহনের একাকিত্ব জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন পরিচালক তা বর্জন করেছেন।

৪) রাজমোহন মকবুলকে শায়েস্তা করার জন্য নানা পরিকল্পনা করেন। মকবুলকে মিথ্যে মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে দেবার কথা ভাবলেও পিছিয়ে আসেন। কারণ মকবুল তার ভিটে-বাড়ির প্রজাও নয়,

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

কোনো টাকাপয়সা ধার নেয়নি। তাছাড়া মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দিলেও পাকিস্তান আমলে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী পাওয়া যাবে না। তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মকবুলের কাছে থেকে দুধ নেওয়া বন্ধ করেন। এতদিন বাড়িতে কামলা-কিষাণ খাটাতে হলে মকবুলকেই ডাকতেন। তাও বন্ধ করেন। খিদের জ্বালায় মকবুল রাজমোহনের বাগান থেকে এক কাঁদি পাকা সুপুরি, দুটো ডাব-নারকেল চুরি করে। রাজমোহন তা জানতে পেরে মুরারি মণ্ডলের ছেলেকে পাহারায় রাখে। কিন্তু চুরি করে তো আর জীবন নির্বাহ হয় না। অবশেষে বাধ্য হয়ে মকবুল নিজের গরু বিক্রি করে দেয়। ডিঙি বিক্রি করে ছোটো নৌকা কেনে। কিন্তু নওপাড়ার ঘাটে নৌকা বেঁধে রেখে হাট করতে গেলে নৌকা চুরি হয়। তাই সবদিক দিয়েই মকবুল হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়ে।

চলচ্চিত্রে দেখা যায়, রাজমোহন নিজে যেমন মকবুলের প্রতি অসহযোগিতা করেছে, তেমনি পরিচিত পরান পোদ্দার, নিবারণ বসাক ও ত্রৈলোক্য জোয়ারদারকে বলেছে তার দুধ নেওয়া বন্ধ করতে। রাজমোহন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মৌলবিকে বলেন, মকবুলের গরু তার বাগানের বেড়া ভেঙে চারা নষ্ট করেছে। এখানে গ্রামীণ ষড়যন্ত্রকে অনেক বড়ো করে দেখিয়েছেন পরিচালক। গেদু মুন্সী, ছদন মৃধা, কাজী সাহেব ও মৌলবি হাফেজউল্লা প্রত্যেকেই পালঙ্ক হাতানোর জন্য মকবুলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়। মৌলবি কদম আলিকে দিয়ে মকবুলের ডিঙিটাকে নদীর জলে ডুবিয়ে দেয়। পালঙ্ক না পেয়ে নানা উপায়ে তার অনিষ্ট করতে চাইলেও মকবুলের প্রতি রাজমোহনের প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা ছিল। বাগান থেকে মকবুল ডাব চুরি করলে তিনি নিজেই পরানকে দিয়ে চুরি যাওয়া ডাব অন্যত্র লুকিয়ে রাখতে বলেন। যাতে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা কোনোভাবেই মকবুলের অনিষ্ট করতে না পারে।

৫) কাহিনির অন্তিমে লেখক ক্ষয়, ধ্বংস, হানাহানি ও রক্তপাতে সিক্ত মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে পাশ ঠেলে যে সর্বকালীন মানবতাবাদের চিত্র তুলে ধরেছিলেন, সেই মানবিক মূল্যবোধকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন চলচ্চিত্রকার।

গল্পকারের বর্ণনায়—

> "মকবুল বলল, 'আইছিল। দেড়শর ওপর আরও দশ টাকা বেশি দিতে চাইছিল। তবু ফিরাইয়া দিছি। দুইদিন ধইরা উপাস ধলাকর্তা। তবু শালারে ফিরাইয়া দিতে পারছি। তবু শালার ক্ষিদার জ্বালারে ঠেকাইয়া রাখতে পারছি। বউটা কান্দাকাটি করতেছিল। কইলাম কি ধলাকর্তা, কইলাম— মাগী, আমারে আইজকার রাতখান সময় দে। অবুঝ প্যাটটারে জোর কইরা খামচাইয়া ধইরা থাক। আইজকার মত, আমার মান বাচা, জান বাচা রাখতে দে পালংখানা।'... তারপর কেউ আর কোন কথা বলল না। ফতেমা ঠিক তেমনি ক'রে কেরোসিনের ডিবাটা দু'জনের সামনে ধ'রে রইল। আর সেই ধোঁয়া-ওঠা ক্ষীণ দীপের আলোয় মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্ক-প্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্ক-প্রেমিক, ধলা আর কালো— দুই রঙের দুই পালঙ্ক প্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

একটু বাদে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মকবুল বলল, 'ফতি পোলাপান দুইডারে নিচে নামাইয়া শোয়া। আমি পালং খুইলা ধলাকর্তারে দেই।'

রাজমোহন বললেন, 'সে কি কথা, মকবুল!'

মকবুল বলল, 'হ ধলাকর্তা, আপনে নিয়া যায়ন পালং। আইজ আমি রাখলাম। কাইল যদি না রাখতে পারি?'

ব'লে মকবুল সত্যিই ছেলেমেয়ে দুটিকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, রাজমোহন বাধা দিয়ে ওর হাত ধরলেন, বললেন, 'খবরদার!'

তারপর আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন 'এতদিন চুরি কইরা কইরা তোর ঘরের পালং আমি দেইখা গেছি মকবুল। কিন্তু খালি পালং-ই দেখছি। আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম— দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে। আমারে পৌঁছাইয়া দিয়া আয় মকবুল।'

স্ত্রীর হাত থেকে কেরোসিনের ডিবাটা তুলে নিতে নিতে মকবুল বলল, 'চলেন ধলাকর্তা।'"[৬]

চলচ্চিত্রকারের উপস্থাপনায়—

"মকবুল: ফতি, পোলাপান দুইডারে, নীচে নামাইয়া শোয়া! আমি পালং খুইলা ধলাকর্তারে দেই।

যেন ডুকরে ওঠেন রাজমোহন—

রাজ: খবরদার মকবুল! ওগো জাগাইস না।

মকবুল: না ধলাকর্তা আপনে পালং নিয়া যান। আইজ আমি রাখলাম কাইল যদি রাখতে না পারি?

ছেলেমেয়ে দু'টোকে সরাতে যেতেই, খপ করে রাজমোহন মকবুলের হাতখানা চেপে ধরে বলেন—

রাজ: পারবি পারবি ! আর কার সাধ্য তর পালং নিয়া যায়।

বিড়বিড় করে বলতে থাকেন—

একদিন চুরি কইরা, তর ঘরের পালংই আমি দেইখ্যা গেছি মকবুল। খালি পালংই দেখছি। আইজ আর আমার পালং খালি না রে। খালি না। অশান্তির পালংখানে কত শান্তি কইরা শুইয়া আছে ওরা। আইজ আর এই চৌদোলা খালি না। আইজ এই চৌদোলাই আমি আরো দুইজনরে দ্যাখলাম।... রাজমোহনের দৃষ্টিকোণ থেকে— ধীরে ধীরে ছেলে মেয়ে দুটির ওপর দিয়ে, তার ঠাকুর দালানের বিগ্রহ পরিস্ফুট হয়— রাধাগোবিন্দ মূর্তিতে। চরিতার্থের অশ্রু গড়িয়ে নামে রাজমোহনের দু'গাল বেয়ে। ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন— নারায়ণ! নারায়ণ!... কাট টু

ভোরের আলো ফুটেছে আকাশে। প্রভাতী আজান আসছে ভেসে।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

Sc-126 সাঁকো— ভোর।

মধ্যযুগের হাত ধরে বর্তমান। হিন্দুর হাত ধরে মুসলমান। সাদার হাত ধরে কালো ওঠে বাঁশের সাঁকোর ওপর। অনির্বাণ আলোই পথ দেখিয়ে— একে অন্যকে পার করতে থাকে। পেছনে পূব আকাশের বুক চিরে ততক্ষণে দেখা দিয়েছে সোনালী আলপনা।

কাট টু

Sc-127 খালঘাট— বিকেল।

গাঁয়ের খাল ঘাটে নৌকো ভেড়ে। রাজমোহন রায়ের একমাত্র উত্তরাধিকার—

একমাত্র পুত্র সুরেন রায় নামছেন নৌকো থেকে। ঘাটে দাঁড়িয়ে মকবুলের ছেলে সবদুল। ডাঙার পিচ্ছিল পথে পা ফেলতেই, সুরেন রায়ের পা হড়কে যায়। খপ করে শক্ত হাতে চেপে ধরে ডাঙায় দাঁড়ায় সবদুল— সুরেন রায়ের হাত।

নিশ্চল মূর্তিতে, হিন্দু মুসলমান নামীয় এক বাঙালী জাতি পরস্পরের হাত ধরে— চিরন্তন বন্ধনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে। ভাষ্যকার কণ্ঠে ঘোষিত হয়—

অতীত কথা কয়! সম্ভাবিত হয় আর এক কাহিনী।

— এই কাহিনীর শেষ নেই!”[৭]

উপরে উল্লেখিত অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্জন ছাড়াও পরিচালক নিম্নলিখিত অংশগুলি **সংযোজন** করেছেন :

১) সুরেন রায়ের আসার সংবাদ পেয়ে মকবুলের ছেলে সবদুল নৌকা নিয়ে মহাকুমা ঘাটে উপস্থিত হয়। সুরেন রায়ের নানা কৌতূহলের নিরসনে পথপ্রদর্শক সবদুল মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গে নানা অভিজ্ঞতার কথা বলে। পথঘাট এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। পাশেই বিগত দিনের কুখ্যাত অঞ্চল। সন্দিগ্ধ লক্ষ রেখে নিমেষে প্রস্তুত হয় সদ্য যুদ্ধফেরত মকবুল। নৌকার পাটাতন থেকে লুক্কায়িত অস্ত্র বের করে। চোখের সামনে নদী সংলগ্ন গ্রাম ও স্মৃতিবিজড়িত নানা দৃশ্যাবলি ভেসে ওঠে। সমস্তই যেন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ভস্মীভূত একটি বাড়ি দেখে সুরেন বিস্মিত হলে সবদুল সক্রোধে বলে, রাজাকার ঢুকিয়ে রেখেছিল বলে মুক্তিযোদ্ধারা মর্টার দিয়ে বাড়িটা গুঁড়িয়ে দিয়ে তাকে উচিত শাস্তি দিয়েছে। লিগ প্রেসিডেন্ট কাজী সাহেব, মৌলবি হাফেজউল্লা, বদন শিকদার ও ছদন মেরধা কাউকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে এও বলে, লীগের অভিসন্ধি না বুঝে তাদের ফাঁদে পা দিয়েছিল।

“‘ঠেইকা শিখছি আর কি!’...বোঝলেন জাইত আমাদের এখন একটাই। ছিলাম মুসলমান হইছি বাঙালী!”[৮]

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

এই দৃশ্য সংযোজনের মাধ্যমে পরিচালক একটা বিশেষ স্থাল ও কালকে তুলে ধরলেন। কিন্তু চিত্রনাট্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়পর্বের নানা তথ্য ও ঘটনা লিপিবদ্ধ থাকলেও চলচ্চিত্রে তা দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে চলচ্চিত্রকার তারেক মাসুদ বলেছেন—

> "মূল গল্পটির লেখক নরেন মিত্র কেবল যে আমার প্রতিবেশী গ্রামের মানুষ ছিলেন, তা-ই নয়, গল্পটি আমার পরিচিত একটি পরিবার ও গ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত। পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে দেশে তখন সামরিক শাসন চলছে। সেন্সর বোর্ড পালঙ্ক ছবিটির মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়-সংশ্লিষ্ট রঙিন অংশটুকু কেটে বাদ দিল। জবাই করে রক্তাক্ত করল প্রধানত সাদা-কালোতে নির্মিত রাজনৈতিকভাবে নিরীহ ছবিটিকে।... দ্বিতীয় সম্পাদক সেন্সর বোর্ডের কল্যাণে পৃথক পালঙ্ক একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছিলাম। ব্যস, ফেঁসে গেলাম।"[৯]

২) দেশভাগের ফলে অস্তিত্বের সংকটে পড়ে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ জলের দরে সবকিছু বিক্রি করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাত্রা করে। এরই বিপরীতে কিছু সুবিধাভোগী মানুষ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। রেজিস্ট্রি অফিসে যাবার পথে রাজমোহনের সঙ্গে পূর্বপরিচিত শ্রীপদর সঙ্গে দেখা হলে সে জানায়, তারা সকলে বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। রাজমোহনকেও যাবার পরামর্শ দিলে তিনি রাজি হন না। এই দৃশ্য সংযোজনের মাধ্যমে পরিচালক গ্রাম-শহরের দ্বন্দ্ব তথা গ্রামের সবুজ শ্যামলিমার বিপরীতে শহুরে অন্তঃসারশূন্য জীবনকে তুলে ধরেছেন। মহানগর কলকাতার মেকি ও স্বার্থান্বেষীর ভিড়ে মিশে আছে এক খোলস যা রাজমোহনের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। তিনি দেখেছেন এক গোলকধাঁধা যেখানে ঘোমটার ভেতর খ্যামটা নাচ। তাই, দয়া-মায়া-মমতাহীন ইট-কাঠের স্তূপে যেতে তার মন সায় দেয়নি। তার কাছে স্বদেশ হল নিজের গ্রাম, গ্রামের সবুজ,সহজ-সরল মানুষেরা—

> "যে আচারের সঙ্গে আমার কোন মিল নাই, যারে জানি না, চিনি না — সে আমার দেশ হতে পারে না ছিরিপদ। থাকতে না পাইরা গেছিলাম তো গত বছর। দেইখা আসছি তাগো। আহা, কি সুখেই না আছে সব! দেইখা আসছি।
>
> Sc-18 কলকাতার সরুগলি দুপুর
>
> রাজমোহনের বর্ণনার সঙ্গে, দৃশ্যগুলো দেখা দিতে থাকে।
>
> রাজ: চিপা চিপা গলি। দুই পাশে খালি উঁচু উঁচু দালান আর দালান। দুইতলা, তিনতলা, চাইর তলা— আকাশের মুখ দেখার উপায় নাই। যে দিকে চাও, এতটুকু সবুজের চিহ্ন পাইবা না— খালি ইটের গাদি। আর তার মইধ্যে দুইখান কবুতরের খোপ। বোঝলা, কবুতরের খোপ, দিনের বেলায় যেখানে বিজলী বাতি জ্বালাইতে লাগে! আর ঘড়ি দেইখ্যা কইতে হয় আকাশে সূর্য আছে কি নাই! পাশাপাশি ঘরে বসে কেউ কাউরে চেনে না। এক ঘরে অসুখ বিসুখ, অন্য ঘরে তখন কলের গান বাজে। কাট টু

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

Sc-19 কুমার নদী— বিকেল

দৃশ্যপট শেষ হয়। রাজমোহন শ্রীপদর উদ্দেশে বলে চলেন—

রাজ: দেইখা শুইনা, আমার তো দম বন্ধ হইয়া যাওয়ার জোগাড়। এই নিয়া অদের প্রশ্ন করলে, কবে— কাট টু

Sc-20 কলকাতায় সুরেন রায়ের ঘর— দিন

সুরেন: বাবা এটা কোলকাতা! এখানে কাঠা ছটাকে হিসেব হয়। বিশেষ খবর কেউ রাখে না।

অসীমা: ভাগ্যিস আমরা তাড়াতাড়ি এসে পড়েছিলাম, তাই কপালে এই আশ্রয়টুকু জুটেছে। দেখে আসুন গিয়ে রিফিউজিদের অবস্থা। কাট টু

Sc-21 রিফিউজি ক্যাম্প ও শিয়ালদহ স্টেশন— দিন

রিফিউজি ক্যাম্প ও শিয়ালদহ স্টেশনে, দুর্দশাগ্রস্তদের দৃশ্য দেখা দেয়। অসীমা কণ্ঠ বিবরণ দিয়ে চলে—

অসীমা কণ্ঠ: কি কষ্টেই না বাস করছে সব। মানুষ আর মানুষ নেই। মানও নেই হুসও নেই। যেন হাত-পা ওয়ালা কতগুলো জন্তু, ছোট্ট একটু জায়গার মধ্যে কিলবিল করছে। কাট টু

Sc -21 A সুরেন রায়ের ঘর—দিন

অসীমা: সে তুলনায় তো আমরা অনেক সুখে আছি বাবা। কাট টু

Sc-22 কুমার নদী—দিন

রাজমোহন বলেন শ্রীপদকে—

রাজ: কথা শোন! অম্বিকা মুখুজ্জ্যার নাতনী, রাজমোহন রায়ের ছেইলার বৌয়ের কথা শোন ! সুখের মানেটারে হারাইয়া মারাইয়া, আইজ কাশ্যপ গোত্র হইছে সব।... দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন রাজমোহন। ঘোলাটে চোখ দু'টো উদাস হয়ে যায়।"[১০]

৩) দেশভাগের ফলে অনেককিছু হারিয়ে গেলেও হারিয়ে যায়নি গ্রামের আন্তরিকতা, মানবিকতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানবিক মূল্যবোধ। হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক বিভাজন সম্প্রীতিকে মুছে ফেলতে পারেনি। অনেক দিন বাদে দুর্গা পূজার সময়ে সুরেন সপরিবারে কলকাতা থেকে গ্রামে ঘুরতে এলে প্রতিবেশী বদর মুন্সী নতুন পোশাক নিয়ে তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

"ছেলেমেয়েরা এসে জামা কাপড়ের সামনে ভিড় করে। বাইরের দরজার কোনায়, জুতো ও ছাতা রেখে ঘরে ঢোকে বদর মুন্সী। অসীমা বলে—

অসীমা: এত সব কেন করতে গেলেন বদর চাচা?

বদর: এতদিন বাদে তবু দ্যাশের কথা মনে পড়ছে। পূজায় ছেইলা পিলা নিয়া বাড়ি আসছে— এই মওকায়, আমিও পুরানা রেওয়াজটা ঝালাইয়া গেলাম আর কি! তবে, আমাগো দিনকাল তো গেল

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

গিয়া। নয়া দিনকাল যা আসতেছে, তাতে আর ভরসা নাই। কতই শুনি, মাতৃভাষা ভুইলা, এরপর নাকি উর্দু কওয়া লাগবে।

রাজ: আরে তুমিও যেমুন!— যত হুজুইগা কথা শোন! জাতিতে বাঙালী ক'বে উর্দু, হুঃ।"[১১]

৪) বৌমার প্রতি রাগান্বিত হয়ে রাজমোহন পালঙ্ক বিক্রি করে তাকে পাঠানোর কথা বললে মকবুলের স্মৃতিপটে পালঙ্কের ছবি ভেসে ওঠে। পালঙ্কের ওপরে মকবুলের অনুরাগ কতখানি গভীর তা ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক এই দৃশ্যের সংযোজন করেছেন। বিয়েতে যৌতুক হিসেবে পাওয়া পালঙ্কে জল লেগে গেলে মকবুল অত্যন্ত বিরক্ত হয়।

> "সানাই বাজছে। সারি সারি নৌকো চলছে নদীর ওপর দিয়ে। আগে আগে বরযাত্রীর নৌকো, মাঝে সুসজ্জিত বজরায় বর বৌ। তার পেছনে বাজনদারের নৌকো। মিষ্টি সানাইয়ের সুরে আকাশ বাতাস আচ্ছন্ন।... তারই একটায় স্থান পেয়েছে যুবক মকবুল। বয়স তখন তার কতই বা উনিশ-কুড়ির বেশী নয়।... ছিটকে ছিটকে জল উঠছে। চলকে পড়ছে নিখুঁত পালিশ করা পালঙ্কটার ওপর। কাঁধের গামছা দিয়ে পালঙ্কের গায়ে ছিটকে পড়া জল মুছতে মুছতে মকবুল বলে—

মকবুল: আস্তে ভাই আস্তে! খুবসুরৎ জিনিসখান পয়মাল হইল যে।

মাঝিরা হাসাহাসি করে।

মাঝি: হালার কথা শোন! আরে ওই পালংয়ে ফুল শয্যায় শুবি নাকি রে?

মকবুলের চোখে স্বপ্ন ঘনায়।"[১২]

বিগত শতাব্দীর পাঁচের দশকের সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে লিখিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'পালঙ্ক' গল্প অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রে পরিচালক রাজেন তরফদার লিখিত আখ্যানে বর্ণিত কাহিনিকে হুবহু অনুসরণ করেছেন। আখ্যান বর্ণনায় তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা পছন্দ করতেন না। প্রধানত দর্শকের কথা মাথায় রেখে তিনি সহজ-সরল ভাষায় বক্তব্য বিষয়কে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন, চলচ্চিত্রের মত ব্যয়বহুল শিল্পের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ভর করে প্রধানত দর্শকের উপরে। তাই আলোচ্য চলচ্চিত্রে দেখা যায়, তিনি প্রধানত দর্শকের সাথে একাত্মতা সাধনের জন্য মূল আখ্যানের অনুসরণে কাহিনিকে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। একাত্তরের প্রেক্ষাপটে বাঙালির গৌরবদীপ্ত আখ্যানকে তুলে ধরে অদ্ভুত মুনশিয়ানায় অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধন করে চিরন্তন মানবতাবাদের চিত্র তুলে ধরেছেন।

References

তথ্যসূত্র:

১. বসু, সমীর (সম্পা.)। প্রসঙ্গ: নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা। পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০৯৭, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০১, পৃ. ২৯, ৩০।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

২. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ২৫৭।

৩. মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয়। দ্য ওয়াল। সুখপাঠ, প্রতিপ্রস্তাব পর্ব ২৩।

৪. মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ ও অন্যান্য (সম্পা.)। চিত্রভাষ। কলকাতা-৭০০০১৩, ২৪ বর্ষ, ২য়-৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৭।

৫. তদেব, পৃ. ৬,৭।

৬. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ২৫৬, ২৫৭।

৭. মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ ও অন্যান্য (সম্পা.)। চিত্রভাষ। কলকাতা-৭০০০১৩, ২৪ বর্ষ, ২য়-৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ৬৭,৬৮।

৮. তদেব, পৃ. ২২।

৯. মাসুদ, তারেক। চলচ্চিত্রযাত্রা। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ১২১৫, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃ. ৪৮।

১০. মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ ও অন্যান্য (সম্পা.)। চিত্রভাষ। কলকাতা-৭০০০১৩, ২৪ বর্ষ, ২য়-৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল- ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ. ২৯, ৩০।

১১. তদেব, পৃ. ৩১, ৩২।

১২. তদেব, পৃ. ৩৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

সহায়ক গ্রন্থ

১. বসু, সমীর (সম্পা.)। প্রসঙ্গ: নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা। পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৭০০০৯৭, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০১।

২. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ। গল্পমালা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৫৬।

৩. মাসুদ, তারেক। চলচ্চিত্রযাত্রা। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ১২১৫, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

সহায়ক পত্রিকা

১. মিত্র, জ্যোতিপ্রকাশ ও অন্যান্য (সম্পা.)। চিত্রভাষ। কলকাতা-৭০০০১৩, ২৪ বর্ষ, ২য়-৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৮৯।

সহায়ক ওয়েবসাইট

১. https://www.thewall.in